তুই নিষিদ্ধ তুই কথা কইস না

তসলিমা নাসরিন

বইমেলার নাম শুনলে রক্তে আমার উত্তাল ঢেউ ওঠে। এই বইমেলা দেখতে সাত সাগর তেরো নদী পেরিয়ে চলে আসি এখানে, এই ধুলোবালির কলকাতায়। আসি প্রাণের টানে। আমি তো স্বীকারই করি যে পৃথিবীর কোনও বইমেলার সঙ্গে এই কলকাতা-বইমেলার কোনও তুলনা হয় না। এত যে বইমেলা বইমেলা, কিন্তু বাংলার বইমেলা কত দিন! একশো বা দু'শো বছর পর এই বইমেলার দশা কী হবে, তা ভেবে আমার ভয় হয়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই বাংলা লিখতে পড়তে জানে না, এমনকী ভাল বলতেও জানে না, জানলেও বলে না বা বলতে চায় না। বাংলার প্রতি এদের কোনও ভালবাসা নেই। সম্ভবত হতদরি দ্র চাষাভুষো মানুষের কাছেই বেশ কিছু কাল বেঁচে থাকবে বাংলা বইয়ের মেলা। বইমেলা যদি হয় কোথাও, হয়তো গ্রামের মাঠে ময়দানেই হবে। বাংলাভাষাটি ক্রমে ক্রমে দীন-হীনের ভাষা হয়ে উঠেছে। বাংলার জন্য আমি আপাদমস্তক দীনহীন হতে পারি। কিন্তু দীনহীনের ভাষা তো, এমনই নিয়ম, যে, বিলুপ্ত হয়ে যায়। যাচ্ছে। বাংলা নামের একটি ভাষা ছিল জগতে, এটি এক দিন হয়তো ইতিহাস হয়ে উঠবে, পূর্ববঙ্গে না হলেও এই পশ্চিমবঙ্গে। হয়তো হবে, হয়তো নয়। হয়তোর আভাস দেখি বেশি। বাংলা ভাষাটিকে নিয়ে বাঙালির লজ্জা হয় খুব। আমি সাধারণত বাংলায় বসে বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বলি না কারও সঙ্গে। বাংলায় বাস করা বিহারি ট্যাক্সিওয়ালা, মার ওয়াড়ি ব্যবসায়ী, উত্তর প্রদেশীয় কালাকার সকলের সঙ্গেই বাংলা চালিয়ে যাই, বুঝবে না— তাই বলব না এই ছুতোতে বা থিওরিতে আমি বিশ্বাসী নই। আসলে, বোঝে তারা ঠিকই, কিন্তু ভাষাটি তাদের বোঝার এবং বলার সুযোগটিই কোনও বাঙালি দিতে চায় না। পৃথিবীর সব ভাষাই সুন্দর, সব ভাষাকেই শ্রদ্ধা করি কিন্তু বাংলায় থেকে বাংলায় কথা বলার সুখ আমি পেতে চাই এবং এই সুখ অন্যকেও দিতে চাই। না, এতে মান যায় না, বরং মান বাড়ে। নিজেকে না ভালবাসলে কেউ তেমন কিছু দিতে পারে না নিজের জীবনকে, তেমনই নিজের ভাষাটিকে ভাল না বাসলে, কেউ এই ভাষাভাষির মানুষকে এবং মাটিকে এই ভাষা যে মাটির, দিতে পারে না ভাল কিছু।

বাংলা বইয়ের প্রকাশকদের সঙ্গে বেশ কিছু দিন কথা বলে বিস্মিত হয়েছি যে টিভি কম্পিউটার, এমপি থ্রি, ডিভিডি ইত্যাদিতে মানুষ আঠার মতো লেগে থাকার পরও, যে রকম ভাবা হয়েছিল যে বই বিক্রি কমে যাবে, মোটেও তা কমেনি। ইলেকট্রনিক বই উদয় হওয়ার পর পুস্তক প্রকাশকদের বদ্ধ ধারণা ছিল যে বই কেউ আর কিনবে না, না সেটিও হয়নি। একটি কথা খুব সত্যি, যে, ইন্টারনেট নামের জিনিসটি বই বিক্রি যেমন এক দিকে বাড়িয়েছে, তেমন কমিয়েছে। বইয়ের খোঁজে দোকানে দোকানে ঘুরে এই বই পেলাম তো ওই বই পেলাম না সমস্যার শেষ নেই, কিন্তু ইন্টারনেটের দোকানে বই খুঁজলে যে কোনও দেশের যে কোনও বইই পেয়ে যাচ্ছি, পেতে কয়েকটি ক্লিকের প্রয়োজন, কিনতেও মাত্র দু'-চারটে ক্লিক। এর পর দু'এক দিনের মধ্যেই বই একেবারে ঘরের দরজায় উপস্থিত। উপহার দেওয়ার জন্যও ব্যবস্থাটি চমৎকার। কেবল ক্লিক। রীতিমতো পছন্দের কাগজে বই মুড়িয়ে যে কথাটি লিখতে চাই, সে কথাটি জুড়ে দিয়ে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে যাকে উপহার দিতে চাই তার হাতে। ইন্টারনেটের দৌলতে এ ভাবেই বই বিক্রি বেড়েছে। আবার, এর কারণে বই বিক্রি কিছু কমেছেও, কারণ ইন্টারনেটেই তাবৎ তথ্য মেলে। কোনও বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হলে সেই বিষয়ের ওপর লেখা বই খুঁজে সেগুলো পুরো পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে সময় এবং টাকা খরচ বিষম, কিন্তু ইন্টারনেটে সেই বিষয় বা তথ্য নিমেষেই পড়ে নেওয়া যায়। স ময়ও বাঁচে, টাকাও বাঁচে। ঘটে বুদ্ধি থাকলে লোকে তাই করে আজকাল।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব চেয়ে বড় বইয়ের দোকান এখন নেটে, আমাজন ডট কম । উনিশশো চুরানব্বই সালে দেখল, ইন্টারনেটের কাজকম্ম শতকর া দু' হাজার দুশো হারে বাড়ছে দেখে জেফ বিজোস নামের এক ব্যবসায়ী তার পরের বছরই ইন্টারনেটে বইয়ের দোকান শুরু করলেন। আর করতে না করতেই তিনি একশো ষাটটি দেশের চেয়েও বেশি দেশের এক কোটি তিরিশ লক্ষের চেয়েও বেশি খদ্দের পেয়ে গেলেন। আমাজন ডট কমে আছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বই, সিডি, ভিডিও; শুধু বই-ই এখন তিরিশ লক্ষ। নেটে ইদানীং বাংলা বইয়ের দোকানও প্রচুর হচ্ছে, ঝামেলার কিচ্ছু নেই, ক্রেডিট কার্ডের চল এ দেশে বাড়ছে, তবে আর পিছিয়ে থাকার কারণ কী ! কারণ নেই। তার পরও সাধ জাগে বইয়ের দোকান ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে ছুঁয়ে ছুঁয়ে শুঁকে শুঁকে উল্টেপাল্টে দেখে দেখে বই কিনি। আজ না হোক, অদূর অথবা দূর ভবিষ্যতে এক সময় হয়তো ইন্টারনেটের বইয়ের দোকানও উবে যাবে, বিশেষ করে সে দোকান যদি কাগজের বই-এর দোকান হয়। বই বিক্রি আদৌ যদি হয়, ইলেকট্রনিক বই বিক্রি হবে। ছোট একটি হালকা

পাতলা বইয়ের আকারের যন্ত্র, হার্ড ডিস্কে পছন্দের একশো দুশো বই পুরে রাখা যায়, যখন যেটি ইচ্ছে করে পড়া যায়, বইয়ের কোনও পাতা নেই, আঙুলে ওল্টানোর কিছু নেই। প্রথম পাতা পড়া শেষ হলে বোতা ম টিপলেই পরের পাতা চলে আসবে যন্ত্রের পর্দায়। কোনও বই যদি পড়া হয়ে যায়, তবে যন্ত্র থেকে নিমেষে বোতাম টিপেই হাওয়া করে দেওয়া যায়। বইয়ের সিডি থেকে যন্ত্রে আবার নতুন বই ঢুকিয়ে নিলেই হল। ইলেকট্রনিক বইয়ের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে চমৎকার। বই বহনের ঝামেলা বাঁচে, বই রাখার জন্য বিস্তর জায়গাও ছেড়ে দিতে হয় না। কিন্তু, মন মানে না। ইচ্ছে করে কাগজের বই থাকুক, যে করেই হোক বেঁচে থাকুক। কাগজের বইয়ের মেলা হোক মাস মাস, বছর বছর। ম্যালা বইয়ের মেলা হোক, হারিয়ে যাওয়ার খেলা হোক, ভালবাসার বেলা হোক। কিন্তু, ইচ্ছে করলেই কি বিজ্ঞানের অগ্রগতি রোধ করতে পারব আমি! আমি বিজ্ঞান-বিরোধী নই মোটেও, বরং একটু বেশি রক মই বিজ্ঞান-বিশ্বাসী। তাই বলে, রোবটে ছেয়ে যাক দুনিয়া, চাই না। মেশিনের ওপর বেশি নির্ভরতা কবে না জানি মনকেও মেশিনের মতো করে দেয়। মুড়িভাজা আর গরম চা খেতে খেতে পাতা উলটে কাগজের বই পড়ার সুযোগ যদি ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েরা না পায়, তাদের জন্য আমার করুণাই হবে। কিছু জিনিস আছে, যে জিনিসের কোনও বিকল্প হয় না।

বই কি এখন খুব বেশি কেউ পড়ছে না! পড়ছে। তবে শিক্ষিত মানুষ যে হারে বাড়ছে, সে হারে পড়ুয়া বাড়ছে না। পড়ুয়া কারা বেশি! একবাক্যে কয়েক জন প্রকাশক জানালেন, মেয়েরা। মেয়েদের পরের কাতারে আছে বাচ্চা। বাচ্চারাও পড়ছে বেশ। কম পড়ার দলে আছে পুরুষ। ক ম পড়বে কিন্তু লিখবে বেশি। পুরুষেরা বিদ্যে যত না আহরণ করে, তার চেয়ে বেশি বিতরণ করে— মুশকিল এখানেই। মেয়েদের পর্যবেক্ষণক্ষমতা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি, তার পরও মেয়েরা কেন কম লেখে! এর একটিই কারণ, সময় নেই। ঘরসংসার সামলাতে হয় মেয়েদের, বাচ্চাকাচ্চা, রান্নাবান্না, মোট কথা সংসারে সাতশো রক ম কাজে শারীরিক ভাবে, মানসিক ভাবে, মনস্তাত্ত্বিক ভাবে আটকে থাকতে বাধ্য মেয়েরা। তাই সৃষ্টিশীল কাজে, লেখালেখির কাজে, আঁকাআঁকির কাজে পুরুষের চেয়ে কম সময় পায় মেয়ে। এ সব কাজকে তো এখনও কাজ বলে মনে করা হয় না। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য। ঘরসংসারটি হল সবচেয়ে পয়লা, এর পর যদি স্বামী বা শ্বশুরবাড়ি থেকে অনুমতি নিয়ে চাকরিবাকরি বা টাকাপয়সা রোজগারের জন্য কাজকম্ম (তাও সব ধরনের কাজ নয়, যে ধরনের কাজকে মেয়েদের জন্য ভাল বা চলে বলে ধরা হয়, সে সব কাজই), করা যায়— না হয় কষ্টেসৃষ্টে সে সব চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু

লেখালেখি করার ফ্যাশনটা তো চলবে না বাপু। মেয়েদের জন্য এ হল ফ্যাশন, এক ধরনের বাড়াবাড়ি, ঢং, আহ্লাদ। মেয়েরা খুব সযত্নে বাড়াবাড়ি করা থেকে তাই নিজেদের বিরত রাখে। পুরুষতন্ত্রের সহায় মেয়েরা যত বেশি, তত হয়তো কোনও পুরুষও নয়। তা ছাড়া মেয়েরা লেখাপড়াই বা করতে শিখছে কবে থেকে! পুরুষতন্ত্র তো এই সুযোগটি মেয়েদের দেয়নি খুব একটা।

বাংলাদেশে বই রফতানি করার পাট পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চুকেছে বলতে হয়। চুকবে না কেন, দেদারসে জাল বই বেরোয় ও-দেশে। আজ এখানে শারদীয়ায় উপন্যাস ছাপা হল, ওখানে কাল সে উপন্যাস বেরিয়ে গেল বই হয়ে। কে কাকে বাধা দেবে! এ সবের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই, থাকলেও তার প্রয়োগ নেই। এ বাংলাদেশের ব্যাপার। কিন্তু, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পার্থক্য এখন, কেউ লক্ষ করলেই দেখবে যে অনেকটাই কেটে যাচ্ছে। আমি অন্তত, এ রকমই জেনেছিলাম, যে, জাল বই প্রকাশনার সুযোগ আর কোথাও থাকলেও, এই পশ্চিমবঙ্গে নেই। কিন্তু কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়াতেই প্রকাশকদের নাকের ডগায় দেখি জাল বই বিক্রি হওয়ার ধুম এবং এই ধুম নিয়ে কারও দুশ্চিন্তা না হওয়া এবং কোথাও কোনও প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর না ওঠা আমাকে স্তম্ভিত করেছে। কে বা কারা এই জাল বইয়ের প্রকাশক, তা জানার সাধ্য অন্তত আমার মতো অসহায় লেখকের নেই। জাল বই লোকে কিনছে, দেড়শো টাকার নিষিদ্ধ হওয়া বই শুনেছি দেড় হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। লালবাজারের লোকেরা জাল বই-ব্যবসায়ীদের প্রতি মনে হয় অত্যন্ত সহৃদয়, তাদের বিরুদ্ধে কোনও রকম ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোর বিরোধী তারা। অবৈধ ভাবে অবৈধ ব্যবসায়ীরা অবৈধ বই ছাড়ছে বাজারে, এই অভিযোগ বহু করা হয়েছে, কিন্তু প্রশাসনও কোনও তাগিদ দেখায়নি অবৈধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। দ্বিখণ্ডিত নামের একটি বই বছর পার হয়ে গেল— এ দেশে আজও নিষিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই বইটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর সামান্য কিছু প্রতিবাদ হয়েছিল। প্রতিবাদে কাজ হয়নি, সরকার বইটি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেনি। নিষিদ্ধ জিনিস শেষ অবধি নিষিদ্ধই থেকে গেছে। লেখকের মত প্রকাশের অধিকার, পাঠকের পাঠ করার অধিকার অবলীলায় কেড়ে নিয়েছে সরকার। আমার আশঙ্কা হয়, নির্বিঘ্নে জাল বই বাজারে বিক্রি করে করে এর পর না স্বভাবই হয়ে দাঁড়ায় জাল বই ছাপানোর। যদি বইপাড়া ছেয়ে যায় জাল বইয়ে! ছেয়ে যায় চোরে, ডাকাতে, মিথ্যুকে, কালোবাজারিতে! দৃশ্যটি নিশ্চয়ই আমাদের কল্পনা করতে অসুবিধা হয়। দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিলে দুর্নীতি মাথায় ওঠে।

বাংলাদেশেও জাল বই একটা দু'টো শুরু হয়েছিল, কেউ তেমন গা করেনি প্রথম, এখন ওখানে জাল বই-ব্যবসায়ীদেরই দাপট বেশি। ওদের দাপটে ঢাকার পুস্তক প্রকাশকদের অনেকে ব্যবসা ছেড়ে পালিয়েছে, এক দল মাটি কামড়ে এখনও পড়ে আছে, আর এক দল নিজেরাই পাইরেসিতে নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গ তো অন্তত শিক্ষা নিতে পারে এ সব দেখে। পশ্চিমবঙ্গ তো অন্তত পাইরেসির বিরুদ্ধে যা হোক কিছু রা শব্দ করতে পারে। বই নিষিদ্ধ করার যে আইনটি তিনি খাটিয়েছেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো অন্তত সেই আইনটি যথাযথ কায়েম করার চেষ্টা করতে পারেন। নাকি, বইটির বৈধ প্রকাশকের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিয়ে অবৈধ প্রকাশককে বইটি ছাপাবার অধিকার দেওয়াই ছিল বই নিষিদ্ধ করার পিছনে মূল উদ্দেশ্য? বৈধ বই পড়ে আছে লালবাজারের বদ্ধ ঘরে, অবৈধ বই-এ বাজার ছাওয়া। অবৈধের জয়জয়কার চারিদিকে, নিষিদ্ধের পোয়াবারো।

পশ্চিমবঙ্গের কিছু জনপ্রিয় পুরুষ-লেখক বাংলাদেশে প্রায়ই বেড়াতে যান মোগলাই খানাপিনা, অবাধ খাতির যত্ন আর খানসামাওয়ালা বাড়ির যারপরনাই আরাম পেতে, তাঁরা কিন্তু পাইরেসির বিরুদ্ধে মোটেও ওখানে মুখ খোলেন না। মুখ খুললে বিদেশের আরাম আয়েস যদি কিছু কমে যায়! বই নিষিদ্ধ হয়েছে বলেই পশ্চিমবঙ্গে জাল বইয়ের উৎকট উৎপাত। এখানকার কিছু লেখক ক'জন মুসলমান লেখক সঙ্গে নিয়ে বই নিষিদ্ধ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বোকা মুসলমান লেখকদের ঘাড়ের ওপর নিষিদ্ধের দায়ও অনেকটা চাপানো গেল, মুসলমানের ধর্ম রক্ষা করার এই আহামরি আবেগ দেখিয়ে বেশ ধর্মনিরপেক্ষ সাজা গেল আর ও দিকে বাংলাদেশের আরাম আয়েসের ব্যবস্থাও বেশ পাকা রইল, আর সাহিত্যজগতের পুরুষতান্ত্রিক নিয়ম মেনে না চলার শাস্তিও আমাকে বেশ আচ্ছা করে দেওয়া হল।

আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। যে মৌলবাদীরা আমাকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশ জুড়ে ক্ষেপে উঠেছিল, তাদেরও, আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি যে যা খুশি তা বলার অধিকার আছে, যা প্রাণে চায় তা লেখার অধিকার আছে।এখানে এ দেশেও অন্যের মত প্রকাশের স্বাধীনতায় অনেকে বিশ্বাসী নন। এখানেও আমাকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেবার, সব কিছু থেকে আলগোছে আমাকে সরিয়ে দেবার, আমাকে বাতিল করার, আমাকে ছুড়ে ফেলার, একঘরে করার, একা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে গেছে। খুব গোপনে গোপনে এ দেশেও হয়তো আমি পুরোদস্তুর অচ্ছুৎ হয়ে পড়ে থাকব, আমার দিকে চমৎকার হাসি হাসি মুখ নিয়ে তাকিয়ে থাকা শক্তিমান সাহিত্যিকরা হয়তো এক দিন আমাকে আর কলকাতার বইমেলার চৌহদ্দিতে ঢুকতে দেবেন না, যে

মন দেয়নি বাংলাদেশে। ভয় হয় এক দিন হয়তো এ দেশে আমার ঢোকার সব পথই বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে একটি আশঙ্কা। এই আশঙ্কা মৌলবাদীদের নিয়ে নয়, এ আশঙ্কা মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে, এ আশঙ্কা বিখ্যাত পুং-সাহিত্যিকদের নিয়ে।

আমি এখানকার কোনও দলাদলিতে নেই। আমার কোনও দল নেই। গোষ্ঠী নেই। আমাকে যারা জন্মের শত্তুর বলে মনে করে, তাদেরও আমি অবন্ধু ভাবতে পারি না। এই না-পারার স্বভাবটি জন্মগত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হলে রাজনীতি সমাজ শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদি যে কোনও বিষয় নিয়ে আড্ডা-আলোচনায় বসে যাই। যদিও তিনি আমার দ্বিখণ্ডিত বইটি অথবা বইয়ের দুটি পাতা অন্তত নিষিদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। দ্বিখণ্ডিত বইটি লিখেছি বলে বিখ্যাত লেখক সমরেশ মজুমদার আমাকে বেশ্যারও অধম বলে গালি দিয়েছেন, তাতে কী! দেখা হলে তাঁকেও আমি নমস্কার জানাই। শঙ্খ ঘোষকে চিরকালই শ্রদ্ধা করি। যদিও তাঁর হাতে গুজরাতের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানের জন্য সাহায্য ঢালার পর, মুসলমানদের পয়গম্বর সম্পর্কে কটু মন্তব্য করেছি— এই অভিযোগ করে দ্বিখণ্ডিত নিষিদ্ধ করায় সায় দিয়েছিলেন তিনি। কবীর সুমন, অশোক দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিত, আজিজুল হক, সুবোধ সরকার, কৃষ্ণা বসু, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এবং এমন অনেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কোনও কারণ কখনও ছিল না, এখনও নেই। তাঁরা নিজেরা লেখক হয়ে অন্য লেখকের বই নিষিদ্ধ করার জন্য পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, রেডিও-টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, আদালতে গিয়েছেন— এ সম্পূর্ণই তাঁদের নিজ নিজ আদর্শ, বিশ্বাস এবং রুচির ব্যাপার। আমাদের মতবিরোধ থাকতে পারে, তাই বলে একে অপরের ওপর হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার কোনও যুক্তি আমি দেখি না। মতের মিল নিয়ে এবং একই রকম করে মতের বিরোধ নিয়েও সুস্থ বিতর্ক কিংবা আলোচনা হতে পারে। সকলেরই বলার অধিকার আছে, মানুষ মাত্রেরই আছে। কিন্তু এখানকার নামী দামি পুরুষ-কবিলেখকদের কোনও অশোভন আচরণ বা অন্যায় নিয়ে লক্ষ করেছি, মুখ খোলা, পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট। এঁদের নমো নমো করে চলার নিয়ম এখানে, নিয়মটি ভাঙলেই সব্বোনাশ। নিয়মিত গুরুদক্ষিণা দিয়ে শিষ্যজাতিকে বেঁচে থাকতে হয়। নামী দামিদের শক্তি এবং দাপট এ অঞ্চলে খুব বেশি। তাঁরা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রচ্ছায়ায় বাস করেন বলেই সম্ভবত এই দাপট। টার্গেট যদি এক বার হয়ে বসো, সাহিত্য-রাজনীতির সন্ত্রাস, তুমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পুঁটি হলেও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। মাফিয়া কোথায় নেই! যে বুদ্ধিজীবী মহাশয়গণ বুদ্ধি বিক্রি করে জীবন যাপন করেন, যাঁদের বুদ্ধিতে স

মাজের অনেক কিছু ভাঙে এবং গড়ে ওঠে, সেই বুদ্ধিজীবীরা যদি ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনম্মন্যতা ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারেন, তবে তাঁদের কতটুকু ক্ষতি হয় জানি না, অনেক বেশি ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষ তো বুদ্ধিজীবী থেকেই শেখে অনেক কিছু।

তার পরও, আমাদের ঈর্ষা, ভালবাসা, আমাদের ঘৃণা, গৌরব— সব কিছুর মধ্যেও হইরই করে উৎসবের দিন আসে। শীত জুড়ে মেলা বসে এই বাংলায়। বিশাল মাঠের ঝলমলে বইমেলায় বইপ্রেমীরা ভিড় করে প্রতি দিন। গত বছরের মতো এ বারও দ্বিখণ্ডিত নামের নিষিদ্ধ বইটির খোঁজ করেছে অনেকে, পায়নি। বইমেলার কোনও বড়কর্তার মনেও হয়নি এক বার, অন্তত মেলার দিনগুলোয় বই-নিষিদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু একটা করার। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবীরও তা মনে হয়নি, সাম্যবাদে বিশ্বাসী, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী কারওরই তা মনে হয়নি। আমরা খুব সহজে ভুলে যাই অনেক কিছু। আমরা যা ভুলতে চাই, তা-ই বোধহয় ভুলে যাই।

সমাজে কত রকম অন্যায় ঘটছে, কত রকম অনাচার আমরা মেনে নিচ্ছি। মানুষ বাস করতে পারছে না মানুষের ন্যূনতম অধিকার নিয়ে। তবু, আমরা খুব অনায়াসে অবর্ণনীয় সব দারিদ্র মেনে নিচ্ছি। কোটি কোটি মানুষ না খেয়ে আছে বলে সুস্বাদু খাদ্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছি না। মেনে নিচ্ছি ধনতন্ত্রের বিশ্বায়ন, মেনে নিচ্ছি কুৎসিত পুরুষতন্ত্র, মেনে নিচ্ছি রাজনীতিকদের মিথ্যাচার, মেনে নিচ্ছি প্রশাসনের দুর্নীতি। এত কিছু মেনে নেওয়ার চরিত্র যাদের, বই নিষিদ্ধ হওয়ার মতো তুচ্ছ জিনিস মেনে নিতে তাদের কোনও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। এ নিতান্তই ডালভাত। আমি তো আস্ত বাঙালি, বইয়ের নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে এই যে হঠাৎ হঠাৎ বেওকুফের মতো চমকে উঠি, ধমকে উঠি; উঠি, নিজের বই বলেই হয়তো উঠি।